ইসলামের সোনালী যুগ

এ.কে.এম.নাজির আহমদ

ইসলামের সোনালী যুগ

এ কে এম নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৫
চতুর্থ প্রকাশ : অকটোবর ২০০৪

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
কাঁটাবন, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : পনের টাকা মাত্র

Islamer Sonali Yoog Written and Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 Forth Edition October 2004 Price Taka 15.00 only.

প্রারম্ভিক কথা

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) মাদীনায় যেই ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন তা ছিলো মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। দশ বছর যাবত তিনি ছিলেন এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন আবু বাক্‌র আস্‌সিদ্দিক (রা)। তিনি দুই বছর তিন মাস এই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

আবু বাক্‌র আস্‌সিদ্দিকের (রা) ইন্তিকালের পর মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। তিনি দশ বছর ছয় মাস এই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাহাদাতের পর মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন উসমান ইবনু আফফান (রা)। তিনি বার বছর এই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদাতের পর মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন আলী ইবনু আবী তালিব (রা)। তিনি পাঁচ বছর এই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নানাভাবে এটিকে বিকশিত করেন খুলাফায়ে রাশিদীন। আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীদের শাসনকাল ইসলামের সোনালী যুগ। এই যুগের অনন্য বৈশিষ্টগুলো মুসলিম উম্মার গর্বের বস্তু। এই বৈশিষ্টগুলোই এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

ইসলামের সোনালী যুগ

গণ–সমর্থনপুষ্ট সরকার

ঈসায়ী ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। অতঃপর নবী মুহাম্মাদ (সা) মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেয়ার কঠিন কাজে আত্ম নিয়োগ করেন।

গুমরাহীর চরম সীমায় পৌছে যেসব মানুষ প্রবৃত্তির দাসানুদাসে পরিণত হয়েছিলো তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেনি। বরং তারা নবীর (সা) তৎপরতা খতম করে দেয়ার জন্যে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সত্য সন্ধানী মানুষেরা এই দাওয়াতের মাঝে মানবতার মুক্তিপথ দেখতে পায়। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা এই মহাসত্যকে গ্রহণ করে। এই সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলোকে নিয়েই আল্লাহর রাসূল (সা) গড়ে তোলেন সংগঠন।

সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে যেই লোকগুলো মক্কার বিভিন্ন পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্র (সা) সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা কেবল নির্ভীকই ছিলেন না, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতাও তাঁদের অনেকের মধ্যেই ছিলো। কিন্তু যেহেতু মক্কার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্র রূপ আল্লাহ্র একটি খাস নিয়ামাতের কদর করতে প্রস্তুত ছিলোনা, সেহেতু আল্লাহ্ পাক মক্কায় ইসলামী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন নি।

এদিকে ইয়াসরিব বা মদীনার মানুষ নবীর (সা) দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্বে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন মদীনাবাসীকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপ নিয়ামত দান করার উদ্দেশ্যে নবীকে (সা) সেখানে হিজরাত করার নির্দেশ দেন।

ঈসায়ী ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসেন। মক্কা থেকে আগত মুসলিম, মদীনার মুসলিম এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা ইতিহাসে মদীনার সনদ নামে পরিচিত। এই চুক্তির ভিত্তিতে মদীনা একটি রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং আল্লাহর রাসূল হন এই রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান।

নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন মুসলিমদের অবিসম্বাদিত নেতা। নবীর জীবদ্দশায় অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নেয়ার অবকাশ থাকে না। তদুপরি কালেমা তাইয়েবাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যাংশ দ্বারা মুসলিমগণ রাসূলের (সা) নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নিঃশর্তভাবে তাঁর আনুগত্য করার অংগীকার করে থাকে।

নবীর মতো একজন অবিসম্বাদিত নেতা মুসলিমদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও একটি ভূখন্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে তার অধীনে বসবাস করার মানসিকতা প্রদর্শন না করা পর্যন্ত ইসলামী সরকার গঠিত হয়নি।

বস্তুতঃ ইসলামী সরকার কোন অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠির উপর চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। তাছাড়া এত বড়ো নিয়ামত আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন খামাখাই কোন অনুপযুক্ত জাতিকে দান করেন না।

ইসলামী সরকার আমীর–কেন্দ্রিক। নবীর অবর্তমানে কোন এক ব্যক্তি নিজেকে মানুষের নেতা ঘোষণা করে তার নিকট বাইয়াত হওয়ার আহবান জানাবে ইসলামে এই ধরনের পদক্ষেপের কোন স্বীকৃতি নেই। কোন ব্যক্তির নিজেকে আমীর ঘোষণা করে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব চালানো ইসলাম সম্মত নয়। আমীর হবেন জনগণের সমর্থণপুষ্ট ব্যক্তিত্ব। রাসূলুল্লাহর (সা) সুযোগ্য উত্তরসূরী খুলাফায়ে রাশিদীন জনগণের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন। তাঁরা গায়ের জোরে জনগণের উপর চেপে বসেননি।

খুলাফায়ে রাশিদীন রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং গণ–সমর্থনের প্রতি কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করতেন তার প্রমাণ হিসেবে আমরা আবু বকরের (রা) একটি ভাষণের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

আবু বকর (রা) আমীর নির্বাচিত হবার পর মাসজিদে নববীতে প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে বলেন, "আমাকে আপনাদের আমীর বানানো হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছে করে এই পদ গ্রহণ করিনি। আমি কখনো এটা কামনা করিনি যে আমাকে এই পদে নিয়োগ করা হোক। আমি না তা আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছি, না তার কোন লোভ আমার মনে ছিলো। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বে এই দায়িত্ব নিয়েছি শুধু এই জন্যে যে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরব ভূ-খন্ডে ইসলাম পরিত্যাগের ফিতনা শুরু হয়ে যাবার আশংকা আমি দেখছিলাম। এই পদ আমার জন্যে কোন আরামের বস্তু নয়। বরং এ এক কঠিন বোঝা যা আমার উপর চাপানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এই বোঝা বহনের শক্তি আমার নেই। আমি চাচ্ছিলাম যে অন্য কেউ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। এখনো যদি আপনারা চান তো আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে বেছে নিন। আর আপনারা যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের মানদন্ডে আমার মূল্যায়ন করেন এবং আমার নিকট তাই আশা করেন যা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট করতেন তাহলে আমি অপারগ। কারণ তিনি ছিলেন শাইতান থেকে মাহফূজ এবং তাঁর নিকট ওহী আসতো। আমি যদি ঠিক মতো কাজ করি আপনারা আমার সাহায্য করবেন। আর আমি যদি ভুল করি আমাকে সংশোধন করবেন। সত্যবাদিতা একটি আমানত এবং মিথ্যা খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী। ইন্‌শাল্লাহ্‌ আমি তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করবো। আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল। আমি তার নিকট থেকে হক আদায় করবো। এমন কখনো হয়নি যে কোন জাতি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তার জন্যে লাঞ্ছনা নির্ধারিত করে দেননি। আর এমনটিও হয়নি যে কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা অনাচার বেড়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌ তার উপর বিপদ চাপিয়ে দেননি। আমার আনুগত্য করুন যদ্দিন আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। যদি আমি আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নাফরমানি করি তাহলে আমার আনুগত্য করবেন না। আমি একজন অনুসারী, নতুন পথ আবিষ্কারক নই।"

আবু বকরের (রা) এই ভাষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্রের একজন আমীর আল্লাহ্‌র দাসত্ব, রাসূলের আনুগত্য এবং মুসলিম জনতার রায়কে স্বস্ব স্থানে কতোখানি গুরুত্ব দিতেন।

উমার (রা) এক ঘোষণায় বলেন, "উম্মাহর সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও যারা জোর করে ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।"

আলী (রা) তাঁর এক গভর্ণরকে লিখেন, "তুমি কোন ক্রমেই নিজকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না। তুমি ও তোমার জনগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোন ব্যূহ রচনা করোনা।"

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধানতঃ যেসব কাজ করা হয় সেগুলোর উল্লেখ করে আল্লাহ্ সূরা আল-হাজ্জে বলেন,

"তারা সেসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ার কোথাও ক্ষমতাসীন করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সুকৃতির আদেশ দেয় ও যাবতীয় দুষ্কৃতি থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে।"

রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) শাসনকালে এই কাজগুলো সুশৃংখলভাবে পালিত হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক সালাতের কথা। ইসলামী যিন্দিগীতে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব শুধু আমারই ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণের জন্যে সালাত কায়েম কর।" ত্বাহা ।। ১৪

"সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সর্বোৎকৃষ্ট সালাতের এবং আল্লাহ্‌র সামনে শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াও।" আল-বাকারাহ।।২৩

আল্লাহ্‌র রাসূলও (সা) বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিমদের সামনে সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি সালাতকে ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) একবার সাহাবাদেরকে বললেন, "যদি তোমাদের কারো ঘরের পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে ময়লা থাকতে পারে কি?" সাহাবাগণ উত্তর দিলেন "না, তার শরীরে ময়লা থাকতে পারে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এই অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। আল্লাহ্ এসব সালাতের বদৌলতে ব্যক্তির গুনাহ মিটিয়ে দেন।"- সহীহ মুসলিম, সহীহুল বুখারী

এক শীতে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরে আসলেন এবং একটি গাছের দু'টো ডাল ধরে নাড়া দিলেন। শুকনো পাতাগুলো ঝড়ে পড়লো। তিনি বললেন, "হে আবুযার, যখন কোন মুসলিম একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করে তখন তার গুনাহ এভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে এই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে।"—মুসনাদে আহমাদ।

রাজধানীর কেন্দ্রীয় মাসজিদ মাসজিদে নববীতে সালাত অনুষ্ঠিত হতো রাসূলের (সা) ইমামতিতে। শহরতলীর মাসজিদগুলোতে রাসূলের মনোনীত ইমামগণ ইমামতি করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত গভর্ণরগণ সেখানকার প্রধান মাসজিদে সালাতের ইমাম ছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) মাসজিদে নববীতে ইমামতি করতেন। আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হবার পর উমার (রা) মাসজিদে নববীতে ইমামতি করতে থাকেন। তাঁর পরে এই দায়িত্ব পালন করেন উসমান (রা)। কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার আগ পর্যন্ত মাসজিদে নববীতে সালাতের ইমামতি করতেন আলী (রা)। কুফায় অবস্থান কালে সেখানকার প্রধান মাসজিদে তিনি সালাতের ইমাম ছিলেন।

সেই যুগে মুসলিম যিন্দিগী থেকে সালাতকে পৃথক করে দেখার কোন উপায় ছিলনা। সালাতের জামায়াতে শরীক না হয়ে কারো পক্ষে মুসলিম বলে পরিচিত থাকা সম্ভব ছিল না। সেই জন্যে মুনাফিকগণও বাইরে মুসলিম পরিচয় বজায় রাখার জন্যে সালাতের জামায়াতে যোগদান করতে বাধ্য হতো।

যাকাত ব্যবস্থা সংরক্ষণ

সালাতের পরে যাকাতের স্থান। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগেই শুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গিয়েছিলো। বিত্তবানগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রীয় বাইতুল মালে যাকাত জমা দিতেন। যাকাত আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা) হিজরী নবম সনের পহেলা মুহাররাম প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যে স্বতন্ত্র আদায়কারী নিযুক্ত করেন। যাকাত আদায়কারীদের বিশিষ্ট কয়েকজন হচ্ছেন (১) আদী ইবনে হাতিম তাঈ, (২) সাফওয়ান ইবনে সাফওয়ান, (৩) মালিক ইবনে উয়াইনা, (৪) বারিদা ইবনে হাসিব, (৫) উববাদ ইবনে বিশর আশহালী, (৬) রাফে ইবনে মুকাইল, (৭) কায়েস ইবনে আসিম, (৭) আমর ইবনুল আস, (৮) যাহহাক ইবনে সুফিয়ান, (৯) বুশর ইবনে সুফিয়ান, (১০) যবরকান ইবনে বদর, (১১) আবদুল্লাহ ইবনুল্লাতিহ এবং (১২) আবু জাহাম ইবনে হুযাইফা (রা)।

এই সব আদায়কারী সাধারণতঃ সাময়িকভাবে নিযুক্ত হতেন। প্রয়োজনে তাঁদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হতো।

বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করা হতো। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষিত হতো। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা হেরে যেতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তাদের অস্থির হতে হতো না।

সালাতের মতো যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখার জন্যেও খুলাফায়ে রাশিদীন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে আবু বকরের (রা) অবদান সবচে' বেশী।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর অন্তরে যাদের ব্যাধি ছিলো তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বনু আসাদ, বনু ফাজারা, বনু গাতফান, বনু সালাবা, বনু মুররাহ্, বনু আব্স প্রভৃতি গোত্র আবু বকরের (রা) শাসনকালে যাকাত না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মদীনার চারদিকে এসে ছাউনী ফেলে। তারা প্রথমে আবু বকরের (রা) নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং

এই কথা জানায় যে তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু যাকাত দেয়া থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিতে হবে।

যাকাত অস্বীকারকারীদের সংখ্যা ছিলো বিপুল। এ দিকে সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ তখন উসামা ইবনে যায়িদের নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল সিরিয়াতে। এমতাবস্থায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ ব্যাপার ছিলোনা। মাজলিসে শূরার অনেক সদস্য অবস্থার নাজুকতা দেখে তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়া যায় কিনা, তা ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু সিংহের মতো গর্জে উঠেন আবু বকর (রা)। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র কসম, যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সময়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাকাত দিতো, আজ যদি সে তা দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো।"

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির মাঝে আবু বকর (রা) দেখেছিলেন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন।

আবু বকর (রা) মদীনার মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হবার আহ্বান জানালেন। গড়ে উঠলো সেনাবাহিনী। সেনাপতিত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন আবু বকর (রা)। সহকারী সেনাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) প্রমুখসাহাবাগণ।

মদীনার অদূরে বিভিন্ন রণাংগনে যাকাত–অস্বীকারকারীদের সংগে তুমুল লড়াই হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয় যাকাত অস্বীকার কারীদের বাহিনী। নিহত হয় তাদের সেনাপতি হাব্বাল। আবুবকর (রা) যাকাত–অস্বীকারকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করায় এই ফিতনা বহুকাল পর্যন্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির উচ্ছেদ

মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তা তাঁর কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে মানব গোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরেছেন। যা কিছু কল্যাণকর তা ব্যক্তি জীবনে অনুশীলন করার জন্য তিনি তাকিদ করেছেন। আবার যা কিছু অকল্যাণকর তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

সত্যিকার অর্থে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী তারা এই সীমারেখা সঠিকভাবে মেনে চলে তাদের জীবনধারা গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এই সীমারেখা সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য বার বার তাকিদ দিতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে কার্যকর হয়। জনমন্ডলী আন্তরিকতাসহকারে সকল মারুফ কাজ সম্পন্ন করতো। পক্ষান্তরে পূর্ণ সচেতনতা সহকারে তারা যাবতীয় মুনকার থেকে বেঁচে থাকতো।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) শাসনামলে অবৈধ বা নিষিদ্ধ সবকিছুর শিকড় উপড়ে ফেলা হয়েছিলো। জাহিলী যুগের সকল অশ্লীলতার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। অশ্লীল গান, অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল চিত্রাংকন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তখন কঠোরভাবে দমন করা হয় সব ধরনের পাপাচার। ব্যক্তি চরিত্রে, আলাপচারিতায়, লেনদেনে, ব্যবসা-বানিজ্যে, ভূমিব্যবস্থায়, শিল্পনীতিতে, সামাজিকতায়, বিবাহশাদীতে, পরিবার ব্যবস্থাপনায়, খানাপিনায়, পোষাক-আশাকে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেখানে যতটুকু অন্যায়, যুলম ও পাপ ছিলো তা পুরোপুরি বিদূরিত করা হয়। ফলে পবিত্রতা, নিরাপত্তা, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শান্তির এক সুমধুর পরিবেশ গড়ে উঠে।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্র নির্দেশিত মারূফ কাজের প্রবর্তন করেছেন সেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মকান্ডেও দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিষ্ঠিত মডেলকে স্থায়ীরূপ দেয়ার সংকল্প নিয়ে তাঁরা কাজ করেছেন। রাসূলের (সা) যুগে গড়ে ওঠা সুন্দর পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

নবুওয়াতের মিথ্যাদাবীদারদের দমন

আল্লাহর রাসূলের (সা) জীবদ্দশাতেই চার জন ভুয়া নবীর আবির্ভাব ঘটে।

এদের একজন ছিলো ইয়েমেনের এক গোত্রপতি আসওয়াদ আনসী। পার্শ্ববর্তী গোত্রের লোকদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে সে ইয়েমেনে নিযুক্ত রাসূলুল্লাহর (সা) গভর্ণরকে তাড়িয়ে দেয়। অচিরে সে নাজরানও দখল করে নেয়। ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর সে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেথাকে।

তাকে দমন করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায ইবনে জাবালের সেনাপতিত্বে একদল সৈন্য পাঠান। ইতোমধ্যে সানা' শহরের নিহত শাসনকর্তার এক আত্মীয় গভীর রাতে সুকৌশলে আসওয়াদ আনসীর শয়ন ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। এতে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আসওয়াদ আনসী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশাতেই নিহত হয়।

তবে এই সংবাদ যখন মদীনায় এসে পৌছে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত ছিলেন না। আবু বকর (রা) তখন ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর। রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের খবর পেয়ে আসওয়াদ আনসীর সংগী সাথীরা আবার গোলযোগ শুরু করে। আবু বকর (রা) খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সেনাপতিত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে দমন করেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো ইয়ামামা অঞ্চলের বনু হানীফা গোত্রের গোত্রপতি মুসাইলামা। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের বিভিন্ন গোত্র আনুগত্য প্রকাশ করার জন্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাদের প্রতিনিধি দল পাঠাতে থাকে। একটি দলের সাথে মুসাইলামা আসে মদীনায়। রাসূলুল্লাহকে (সা) মুমিনগণ যেভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তা দেখে তার নবী হবার সখ হয়। দেশে ফিরে সে নিজকে নবী বলে ঘোষনা করে এবং একটি সেনাবাহিনী গঠন করে মদীনা আক্রমণের পাঁয়তারা শুরু করে।

এদিকে মধ্য আরবের ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নামের এক মহিলা নবুওয়াতের দাবী করে বসে। সে মদীনা আক্রমণের জন্য খৃষ্টান উপজাতিগুলোর সাথে

মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। সাজাহ প্রথমে মধ্য আরবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসাইলামাকে খতম করার জন্যে ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হয়। যুদ্ধের আগে উভয়ের সাক্ষাত ও আলাপ -আলোচনা হয়। সাজাহ মুসাইলামাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে।

আবু বকর (রা) ইকরামা ইবনে আবু জাহালকে মুসাইলামার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন। ইকরামা সুবিধা করতে পারেননি। এবার খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠানো হয়। সাজাহ ও মুসাইলামার বিয়ের তিন দিন পর মুসলিম বাহিনী ইয়ামামা পৌঁছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সাজাহ পালিয়ে যায়। যুদ্ধে মুসাইলামা নিহত হয়।

নাজদ অঞ্চলের বনু আসাদ গোত্রের গোত্রপতি তুলাইহা নিজকে নবী বলে ঘোষণা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) যিরার ইবনে আযওয়ারকে তার বিরুদ্ধে পাঠান। প্রচন্ড লড়াইতে যিরার নিজেই আহত হন। আবু বকরের (রা) শাসনকালে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সেনাপতিত্বে একটি বাহিনী তুলাইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। তুলাইহা সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যায় এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

নবুওয়াতের মিথ্যাদাবীদারগন ইসলামী জীবন বিধান ভন্ডুল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করার যেই অশুভ তৎপরতা শুরু করে আবু বকর (রা) তা নস্যাৎ করে দেন। সেদিন নবুওয়াতের মিথ্যাদাবীদারগণ এমন দাঁতভাংগা জবাব পেয়েছিলো যার ফলে বহু কাল পর্যন্ত ইসলামের দুশমনেরা এই পথ ধরে এগুবার সাহস পায়নি।

পরামর্শ ভিত্তিক শাসন

আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

"তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) সামষ্টিক কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।"

আশ্‌শূরা

এমনকি আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে (সা) নির্দেশ দেন,

"সামষ্টিক কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"

আলে ইমরান

রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে ওহীদ্বারা নির্দেশিত না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করতেন। বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন এবং উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে রণাংগণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনও মাজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ না করে কোন বড়ো রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রাসূলের (সা) সুন্নাতের ভিত্তিতে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর শূরা বা পরামর্শ দানের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

মুসলিমদের ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মাজলিসে শূরা নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। পরামর্শ দীন ইসলামের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই হতে হবে।

মুসলিমগণ শারীয়াহ্‌র ব্যাপারে পরামর্শ করবে কোন বিধানের সঠিক তাৎপর্য চিহ্নিত করার জন্যে এবং তা কার্যকর করার লক্ষ্যে সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণের জন্যে।

যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছেন সেসব বিষয়ে মাজলিসে শূরা স্বাধীনভাবে কোন নতুন ফায়সালা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারেনা।

পরামর্শ গ্রহণকালে খুলাফায়ে রাশিদীন এই মৌলিক বিষয়গুলো কখনো উপেক্ষা করেননি।

ইসলাম জ্ঞান–চর্চার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোন মানবগোষ্ঠী জ্ঞান চর্চা না করে মানব জাতির নেতৃত্বের আসন পেতে পারে না।

আল্লাহ্ বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং ইল্‌ম লাভ করেছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।"

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তারাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে যারা সত্যিকার জ্ঞানী।"

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন,

"আল্লাহ্ যখন কোন ব্যক্তির কল্যাণ করতে চান তখন তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন" সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

"ইলম হাসিলের জন্য যেই ব্যক্তি ভ্রমণ করে আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের পথ সুগম করেদেন।" সহীহ মুসলিম

"যেই ব্যক্তি ইসলামকে সঞ্জীবিত করার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জন করতে করতে মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য হবে।"

–দারেমী

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আদম–সন্তানদের বিশ্ব–লোক, বিশ্ব–লোকের স্রষ্টা, বিশ্বলোকে মানুষের অবস্থান, পৃথিবীর জীবনে মানুষের কর্তব্য, মানব জীবনের পরিণতি এবং সর্বোত্তমভাবে তার কর্তব্য পালনের উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তোলা।

ইসলাম ঘোষণা করে যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি একমাত্র সার্বভৌম সত্তা। বিশ্বলোকের একটি অংশ এই পৃথিবী। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খালীফাহ বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্–প্রদত্ত ক্ষমতা–ইখতিয়ার প্রয়োগ করবে। আল্লাহ্–প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন এবং রাষ্ট্রগঠন করবে। এক সময়ে ভেংগে দেয়া হবে গোটা বিশ্ব–সৃষ্টি। তারপর নতুনভাবে একে গড়া হবে। এই নতুন অংগনে উত্থিত করা হবে দুনিয়ার সকল মানুষকে। সেখানে পৃথিবীর জীবনের

যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। পৃথিবীর জীবনে কর্তব্য পালন সম্পর্কে যাদের রিপোর্ট সন্তোষজনক হবে তাদেরকে জান্নাতে বসবাস করতে দেয়া হবে। আর যাদের রিপোর্ট অসন্তোষজনক হবে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

এই জীবন দর্শনকে ভিত্তি করেই মুমিনের জীবন গড়ে উঠে। এই জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মুমিন যখন তার আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন ও রাষ্ট্র-গঠন করে তখন সামষ্টিক জীবনে, সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা এবং পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুমিনগণ যেই জীবনদর্শন মুতাবিক জীবন গড়ে তুলে দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তি পথের সন্ধান পেলো সেই জীবন দর্শন তারা তাদের সন্তানদেরকে শিখিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যত জেনারেশনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষার ভূমিকা অনেক বড়ো, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। তাই পরিবারের বাইরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

নবুওয়াত-প্রাপ্তির পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার লোকদের নিকট ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছাতে থাকেন। একজন দু'জন করে সত্য সন্ধানী মানুষেরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) সংগী হতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণকারী এসব ব্যক্তিকে ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান দেবার জন্যে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিলো। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিজের গৃহ ব্যবহার করেন। পরে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আরকাম ইবনে আবুল আরকামের (রা) গৃহটিকে বেছে নেন।

ইয়াস্‌রিব বা মদীনার একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মুসয়াব ইবনে উমাইরকে (রা) ইয়াসরিব পাঠান। লোকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে মাসজিদে নববীর গা ঘেঁষে ছিলো সুফ্‌ফাহ-রাজধানীতে মুসলিমদের প্রধান শিক্ষা নিকেতন। বেশ কয়েকজন সাহাবী সার্বক্ষণিক ভাবে এখানে আল-কুরআন ও আল হাদীস চর্চা করতেন। যারাই তাঁদের কাছে আসতো তাদেরকে জ্ঞানদান করতেন।

মুসলিম উম্মাহর প্রধান শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীগণ।

খুলাফায়ে রাশিদীন আল–কুরআন ও আল–হাদীসের শিক্ষা প্রসারের জন্যে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

যেই যুগে মাসজিদগুলো শুধু সালাতের জন্যেই ব্যবহৃত হতো না। সেগুলো শিক্ষাকেন্দ্রও ছিলো।

মহিলাদের জন্যে পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র আমরা রাসূলের (সা) যুগেই দেখতে পাই। উম্মাহাতুল মুমিনীন বিশেষ করে আয়িশা (রা) ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের গৃহগুলোই ছিলো নারী শিক্ষার কেন্দ্র।

মাসজিদের মতো সাহাবীদের গৃহগুলোও শিক্ষালয়ের মতোই ছিলো। দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে তাঁদের শিক্ষা মাজলিসে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতো।

সাহাবীদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের কাছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা এক দিকে মাসজিদ, অন্যদিকে তাঁদের আবাসস্থল গুলোকে জ্ঞানের আলো বিকশিত করার কেন্দ্রে পরিণত করেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগে সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার যেই আন্দোলন চলেছিলো তার মূল্যায়ন করতে গেলে অবাক হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র একাংশ জ্ঞান–চর্চায় আত্মোৎসর্গ করার কারণেই ইসলামের প্রদীপ এখনো তার সঠিক জ্যোতি নিয়ে টিকে আছে।

বৈষয়িক জ্ঞানের দিক থেকেও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এবং সাহাবাগণ উন্নতমানের ছিলেন। এসব ক্ষেত্রেও সাধারণ মুসলিমগণ তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমদেরকে যেই জ্ঞান দিয়ে গেছেন আজকের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা তা পড়ে অবাক না হয়ে পারে না।

সেই যুগে প্রত্যেক মুসলিম তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ও অশ্ব চালনা শিখতেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলও তাঁদেরকে শেখানো হতো। গোড়ার দিকে এগুলো পারিবারিক বা গোত্রীয় ব্যবস্থাপনায় শেখা হতো। পরবর্তীকালে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠার পর সামষ্টিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সামরিক শিক্ষা দেয়া হতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে প্রতিটি নর-নারীর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষিত ছিলো।

প্রত্যেক নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। কারো জানের ওপর হাত তোলা আল্লাহ্ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

"তোমরা কোন প্রাণ হত্যা করো না আইন সম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে।"

বনী ইসরাইল

শুধু বেঁচে থাকার অধিকারই নয়, প্রতিটি নাগরিকের সম্পদ ও ইযযতের নিরাপত্তা লাভের অধিকারও ছিলো। এই সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের রক্ত (জান), ধন-সম্পদ ও ইযযত-আব্রু ঠিক তেমনিভাবে হারাম করে দিয়েছেন, তোমাদের আজকের দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত।"

ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মানুষের জান, মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় পদক্ষেপই গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে যেই ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতো, মুসলিমদের সাথে যেই ব্যক্তি যুদ্ধরত হতো, ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে যে লিপ্ত হতো, যেই বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করতো অথবা যেই ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করতো ইসলামী শারীয়াহর নির্দেশ মুতাবিক তাকে হত্যা করা হতো। এ ছাড়া হত্যা বা আত্মহত্যা করা যে হারাম তা সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো।

সেই রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিককেই সম্মানের চোখে দেখা হতো। কেননা প্রত্যেকটি মানুষকেই আল্লাহ্ সম্মানের আসন দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

"আমি আদম-সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।"

আল্লাহ্ যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদের সম্মানের হানিকর কোনকিছু করা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির আযাদ জীবন যাপন করার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। কাউকে দাসে পরিণত করার অধিকার কারো ছিলনা।

আল্লাহ্ বলেন,

"এই অধিকার কোন মানুষের নেই যাকে কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াতের মতো মূল্যবান সম্পদ দেয়া হয়েছে–যে সে লোকদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাস হতে বলবে।"

আল্লাহ্ বলেন, "শেষ বিচারের দিন আমি তিন ব্যক্তির দুশমন হবোঃযেই ব্যক্তি আমার নামে চুক্তি করে তা ভংগ করেছে, যে আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করে মূল্য খেয়েছে এবংযেই ব্যক্তি মজুর দিয়ে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক দেয়নি।"

সহীহুল বুখারী

যখন সারা দুনিয়ায় ক্রীতদাস ব্যবসা জমজমাট তখন এই ঘোষণা ছিলো নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক। নতুন করে কাউকে দাস বানানোর কোন উপায় ইসলামী রাষ্ট্রে ছিলো না। তদুপরি দাস আযাদ করে দেবার পক্ষেই ছিলো ইসলামের বক্তব্য।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

"যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণকারী কোন ক্রীতদাসকে আযাদ করবে আল্লাহ্ তার এক একটি অঙ্গের পরিবর্তে আযাদ কারীর এক একটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

রাসূলুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে সকল মানুষই অপর মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত ছিলো। একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব ছাড়া আর কারো দাসত্ব তাদের করতে হতো না।

সেই রাষ্ট্রে প্রত্যেকের বিচার পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। যেই কোন নারী বা পুরুষ তার প্রতি কৃত যুলুমের প্রতিকার লাভের জন্যে অবাধে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে পারতো।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতো সকলে। যেই কোন ব্যক্তি তার মনের কথা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করতে পারতো।

সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যেত না। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে একবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হয়। গ্রেফতারকারী কোন সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বন্দীকে তখুনি মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেন।

জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উমার (রা) গভর্ণরদেরকে বলেন, "মনে রেখো, আমি তোমাদেরকে জনগণের উপর উৎপীড়ক ও প্রভু নিযুক্ত করিনি। আমি তোমাদেরকে নেতারূপে পাঠিয়েছি যাতে জনগণ তোমাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে। তাদেরকে তাদের অধিকার দাও। তাদেরকে মারধোর করে অপমানিত করোনা। তাদেরকে অযথা প্রশংসা করে অহমিকার শিকারে পরিণত করো না। তাদের সম্মুখে দরজা বন্ধ করে রেখোনা। কারণ তাতে ধনীগণ দরিদ্রদেরকে খেয়ে ফেলবে"।

উসমান (রা) তাঁর এক ফরমানে উল্লেখ করেন, "মনে রেখো আল্লাহ্ শাসকদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, তাদেরকে শোষণ করার জন্যে নয়।"

আলী (রা) তাঁর এক গভর্ণরকে লিখেন, "একজন শাসকের জন্যে এটাই সবচাইতে বড় আনন্দ যে তার দেশ ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং শাসকের প্রতি নাগরিকদের মনে আস্থা ও ভালোবাসা বিরাজ করছে।"

ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ছিলো। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষালাভের জন্যে জনগণকে বিচলিত হতে হতো না।এই গুলোর নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব ছিলো সরকারের। আল্লাহ্ বলেন,

"এবং তাদের (ধনীদের) ধন–সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে।"

ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ধনীদের সম্পদের অংশ বিশেষ আদায় করে তা দরিদ্রদের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করে দিতেন।

নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমীরুল মুমিনীনগণ কেমন সচেতন ছিলেন তা নিম্নের কয়েকটি উক্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

উমার (রা) বলেন, "যদি ফুরাত নদীর তীরেও একটি কুকুর অনাহারে মারা যায়, উমারকে তার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াব দিতে হবে।"

আলী (রা) একজন গভর্ণরকে লিখেন, "দরিদ্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণী হচ্ছে পংগু ও ছিন্নমূল গোষ্ঠী। তারা অন্যান্য মানুষের নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার যোগ্য।"

আমীরুল মুমিনীনকে প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নের জবাব পাবার অধিকার ছিলো সকলের। এই প্রসংগে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। একদিন উমার (রা) মাসজিদে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "আমি আপনার কথা শুনবো না যেই পর্যন্ত না আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন।" উমার (রা) তার প্রশ্ন জানতে চাইলেন। লোকটি বললো, "বাইতুলমাল থেকে আমরা একখন্ড করে কাপড় পেয়েছি এবং সেই কাপড়ে আমাদের জামা হয়নি। কিন্তু আপনার গায়ে সেই কাপড়েরই জামা দেখতে পাচ্ছি।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, "সকলের মতো আমিও একখন্ড কাপড় পেয়েছিলাম। আমার অংশটুকু আমি আব্বাকে দিয়েছি।"

সেই কালের দু'টো বৃহৎ শক্তি রোম সাম্রাজ্য ও ইরান সাম্রাজ্য যাঁর ভয়ে কাঁপতো সেই আমীরুল মুমিনীনের সামনে হক কথা বলতে একজন মুমিনের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ও আসতো না।

হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের সম্মেলন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের দূর দূরান্ত থেকে মুসলিমগণ মক্কা ও মদীনায় আসতেন। সেই সময়ে আমীরুল মুমিনীন তাঁদের সামনে উপস্থিত হতেন। যার যা অভিযোগ বা প্রশ্ন তা তাঁকে জানানো হতো।

এরপর আসে একান্ততা রক্ষা করার অধিকারের কথা। প্রতিটি মানুষের পারিবারিক একান্ততা পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত ছিলো। এই একান্ততার হিফাজাতের তাকিদ করে আল্লাহ্ বলেন,

"নিজের গৃহ ছাড়া কারো গৃহে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবেনা।"

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন,

"যদি কেউ অনুমতি ছাড়া কারো গৃহের অভ্যন্তরের দিকে উঁকি দেয় তার চোখ উৎপাটিত করার অধিকার গৃহবাসীদের থাকবে।" –সহীহ মুসলিম।

গৃহের নিভৃতে একজন মানুষ যাতে তার আপনজনদেরকে নিয়ে একান্তভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং তার শান্তি ও স্বস্তি যাতে কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয় তারই নিশ্চয়তা বিধান করেছে ইসলাম।

মানবাধিকারের সঠিক স্বীকৃতি ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই। সত্যিকার অর্থে মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাও ইসলামের স্বর্ণযুগ ছাড়া আর কখনো হয়নি।

সুবিচার ও আইনের শাসন

আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও ইহ্সানের নির্দেশ দিচ্ছেন"।

নবীর (সা) উপস্থিতিতে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আসনে নবী ছাড়া আর কারো আসীন হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাই মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে মাঝে মধ্যে বিচার ফায়সালার দায়িত্ব পালন করেছেন আবু বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা), আলী (রা), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)।

আল্লাহ্র রাসূল (রা) বাযান ইবনে সামানকে ইয়েমেনে, মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে কিন্দা ও ফাদাক এলাকায়, যিয়াদ ইবনে লবীদুল আনসারীকে হাজরামাউতে, আবু মুসা আলআশয়ারীকে যুবায়দ, যামআ ও আদন অঞ্চলে, মুয়ায ইবনে জাবালকে জুন্দে, আমর ইবনে হাযামকে নাজরানে, ইয়াযিদ ইবনে সুফিয়ানকে তাইমা-য়, ইত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কায়, আমর ইবনুল আসকে আম্মানে এবং আলা ইবনে হাদরামীকে বাহরাইনে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আইন শৃংখলা সংরক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা বিচার ফায়সালাও করতেন।

আবু বকরের (রা) শানসনকালে তিনি নিজেই ছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত গভর্ণরগণ বিচার ফায়সালার দায়িত্বও পালন করতেন। তাঁর শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপড়িয়ে ফেলার যেই ভয়াবহ ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছিলো তার মুকাবিলায় তাঁকে অনেক সময় খরচ করতে হয়। তদুপরি তাঁর শাসনকালই ছিলো মাত্র দু'বছর তিন মাস। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিচারের জন্যে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু উন্নত মানের ব্যক্তিদের হাতে প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় সুবিচার বিন্দুমাত্রও বিঘ্নিত হয়নি।

উমার (রা) তাঁর শাসনকালের প্রথমাংশে উক্ত ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। শিগগিরই তিনি উপলব্ধি করেন যে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে ফেলাই উত্তম।

তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্ত করে তাঁদের জন্যে যেই ফরমান পাঠান তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(১) বিচারক সব মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করবেন।

(২) সাক্ষ্য প্রমাণের দায়িত্ব সাধারনতঃ বাদীর উপর।

(৩) বিবাদীর যদি কোন প্রকার সাফাই বা প্রমাণ না থাকে তবে তাকে শপথ করতে হবে।

(৪) উভয় পক্ষ সর্বাবস্থায় আপোষ-নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে আইনের বিরোধী কোন ব্যাপারে আপোষ হতে পারবে না।

(৫) মুকাদ্দমা ফায়সালা করার পর বিচারক ইচ্ছে করলে তা পুন বিবেচনা করতে পারবেন।

(৬) মুকাদ্দমা শুনানীর জন্যে নির্দিষ্ট তারিখ হওয়া প্রয়োজন।

(৭) নির্দিষ্ট তারিখে যদি বিবাদী হাজির না হয়, তবে এক তরফা ডিক্রি হবে।

(৮) প্রত্যেক মুসলিমের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য, তবে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা।

বিচারক সম্পর্কে আলী (রা) যেই সব অতিরিক্ত নীতি নির্ধারণ করেন সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সমস্যার জটিলতা কিংবা সংখ্যার আধিক্যের কারণে তাদের কখনোই মিজাজের ভারসাম্য হারানো উচিত নয়।

(২) যখন তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে প্রদত্ত রায় ভুল হয়েছে তা সংশোধন করা কিংবা সেই রায় বদলে দেয়া তাদের পক্ষে মোটেও মর্যাদাহানিকর ভাবা উচিত নয়।

(৩) তারা লোভী, দুর্নীতি পরায়ণ ও চরিত্রহীন হতে পারবে না।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা অভিযোগের এদিক ও সেদিক আগাগোড়া যাচাই করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিশ্চিত হওয়া অনুচিত, যখন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন আরো বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে নিয়ে তার পর রায় দিতে হবে।

(৫) তাদের অবশ্যই যুক্তি প্রমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং তাদের কখনোই মামলাকারীর দীর্ঘ কৈফিয়াত শুনানোর ব্যাপারে অধৈর্য হলে চলবে না। বিশদ বিবরণের সূক্ষ্ম নিরীক্ষণে এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে সত্যে উপনীত হবার কাজে অবশ্যই ধীরস্থির এবং অধ্যবসায়ী হতে হবে। আর এভাবে যখন সত্য আবিষ্কৃত হবে তখন তাদের নির্ভয়ে রায় প্রকাশ করে বিবাদের ইতি টানতে হবে।

(৬) যাদের প্রশংসা করা হলে আত্মদর্পী হয়ে ওঠে, যারা তোষামোদে গলে যায়, এবং চাটুকারিতা ও প্ররোচনায় বিপথগামী হয় তাদের মধ্যে কেউ বিচারক হওয়া উচিত নয়।

ইসলাম আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আর আইনের চোখে সবাই সমান। আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) শাসনকালে ফাতিমা নাম্মী এক উচ্চবংশীয় মহিলা চুরির অপরাধে গ্রেফতার হয়। উচ্চবংশীয়া হওয়ার কারণে কেউ কেউ তার লঘু শাস্তির কথা বলছিলো। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি এই অপরাধ করতো, তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হতোনা।"

একদিন আমীরুল মুমিনীন উমার (রা) এবং উবাই ইবনে কা'বের (রা) মধ্যে কোন এক বিষয়ে বিবাদ ঘটে। উবাই মদীনার বিচারক যায়িদ ইবনে সাবিতের নিকট মুকাদ্দামা দায়ের করেন। সমন পেয়ে উমার (রা) আদালতে হাজির হন। একজন সাধারণ আসামীর মতোই আচরণ করা হয় তাঁর সঙ্গে।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে খৃষ্টান আরবদের বসতি ছিলো। এই অঞ্চলের যুবরাজ জাবালা সেনাপতি আবু উবাইদাহর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসেন। উমার (রা) তাঁকে নিয়ে হজ্জ করতে মক্কায় যান।

ভীড়ের চাপে এক ক্রীতদাস জাবালার দামী পোশাকের কিয়দংশ পদদলিত করে। জাবালা তার গালে চড় বসিয়ে দেয়। যথাসময়ে ক্রীতদাস উমারের (রা) নিকট নালিশ করে। উমার (রা) জাবালাকে ডেকে সব কথা শুনে রায় দেন, "হয় ক্রীতদাসকে আপনার গালে অনুরূপ একটি চড় মারতে দিন, নয়তো তাকে ক্ষতিপূরণ দিন।"

মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আসের (রা) পুত্র কপ্ট সম্প্রদায়ের এক ছেলের গালে চড় লাগায়। বিচার চাওয়া হয় উমারের (রা) নিকট। তিনি নির্দেশ দিলেন কপ্ট ছেলেটি গভর্ণরের ছেলের গালে অনুরূপ চড় লাগাবে। কেউ কেউ আপত্তি তোলে। উমার (রা) বলেন, "কতকাল তোমরা মানুষকে গোলাম করে রাখতে চাও? তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন মানুষরূপে জন্ম দিয়েছে।"

আলীর (রা) শাসনকালে তাঁর একটি হারিয়ে যাওয়া বর্ম এক ইয়াহুদীর কাছে পাওয়া যায়। আলী (রা) বিচারকের দ্বারস্থ হন। পুত্র ও গোলাম ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী হাজির করতে না পারায় বিচারক মামলা খারিজ করে দেন।

খুলাফায়ে রাশিদীন নিজেদেরকে আইনের উর্ধে মনে করতেন না। বিচারক নিযুক্ত করার দায়িত্ব পালন করতেন রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বিচারকগণ ইনসাফের দাবী অনুযায়ী রাষ্ট্র-প্রধানের বিরুদ্ধে নিঃসংকোচে রায় প্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী ছিলো না। তবে অপরাধীকে ধরে আনার দায়িত্ব পালন করতেন কায়েস ইবনে সা'দ (রা)। আর মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), আলী ইবনে আবু তালিব (রা), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা), মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা), আসিম ইবনে সাবিত (রা) এবং যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কিলাবী (রা)।

আবু বকরের (রা) শাসনকালেও স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠেনি। উমারের (রা) শাসনকালে পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠে। আলীর (রা) শাসনকালে পুলিশ বাহিনীর নাম হয় শুরতাহ এবং এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো সাহিবুশশুরতাহ।

বাজার পরিদর্শন, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ দমন এই বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বাইতুলমালে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ

রাসূলুল্লাহর (সা) শাসনকালে বাইতুলমালের আয়ের উৎস ছিলো প্রধানতঃ পাঁচটি। যথা, মালে গানীমাহ, ফাই, যাকাত, জিযিয়া এবং খারাজ।

যাকাত যে এলাকা থেকে আদায় হতো প্রধানতঃ সেখানকার অভাবগ্রস্তদের মধ্যেই বন্টন করা হতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে কোন সম্পদ বাইতুলমালে জমা হলেই তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সেই সম্পদ অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে তবে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন।

আবু বকরের (রা) শাসনকালেও উপরোক্ত উৎসগুলো থেকেই বাইতুল মালে সম্পদ জমা হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বহনের পর বাকী সব অর্থই জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো।

উমারের (রা) শাসনকালে বাইতুলমাল খুব সমৃদ্ধ হয়। তাঁর সময়ে বাণিজ্য শুল্ক প্রবর্তিত হয়। শুল্ক ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে শুল্ক অফিস স্থাপন করেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে শাখা বাইতুলমাল স্থাপিত হয়।

উসমানের (রা) শাসনকালেও বাইতুলমাল খুব সমৃদ্ধ ছিলো। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে বাইতুলমাল থেকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান প্রবর্তন করেন।

আলী (রা) বলেন, "কর আদায়ের ক্ষেত্রে তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে করের চেয়ে করদাতার কল্যাণের গুরুত্ব বেশী।........ যেই শাসক জমির উর্বরতা ও জনগণের সমৃদ্ধির উপর নজর না দিয়ে কেবল কর আদায়ের জন্যে ব্যস্ত থাকে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভূমি, রাষ্ট্র ও জনগণের ধ্বংস ডেকে আনে।....... যদি জনগণ বেশী কর আরোপের অভিযোগ আনে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থার বিপর্যয়, পোকার আক্রমণ, বন্যা ইত্যাদির শিকার হয়ে পড়ে তাহলে তুমি তাদের কষ্ট সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে এবং তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাদের কর কমিয়ে আনবে।....... কর কমানোর কারণে রাষ্ট্রীয় তহবিলের সংকোচন যেন তোমাকে বিচলিত না করে। কেননা একজন

শাসকের জন্যে সবচেয়ে বড়ো বিনিয়োগ হচ্ছে জনগণকে তাদের সংকট কালে সাহায্য করা।"

আলী (রা) বাইতুল মালের অর্থ বন্টনের জন্যে বৃহস্পতিবারকে নির্দিষ্ট করে দেন। সেই দিন সকলে অর্থলাভ করে জাতীয় ছুটির দিন শুক্রবার বেশ আনন্দে কাটাতেন।

খুলাফায়ে রাশিদীন বাইতুল মালের রক্ষক ছিলেন, ভক্ষক ছিলেন না।

খুলাফায়ে রাশিদীন অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু বাইতুল মাল থেকে একজন সাধারণ নাগরিকের সমতুল্য অর্থই তাঁরা নিতেন। কোন অবস্থাতেই বেশী অর্থ নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

খুলাফায়ে রাশিদীন কেবল নিজেরাই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন না, তাদের নিযুক্ত গভর্ণরগণ যাতে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন।

উমার (রা) নিযুক্তিকালে গভর্ণরদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতেন যে তারা তুর্কী ঘোড়ায় চড়বে না, দামী পোশাক পরবে না, মিহি ময়দার রুটি খাবে না এবং দরজায় দারোয়ান রাখবে না।

উসমান (রা) গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক ফরমানে বলেন, "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করার ফলে দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছো। সাবধান, দুনিয়া যেন তোমাদেরকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

আলী (রা) তাঁর একজন গভর্ণরকে লিখেন, "যেটাতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে তা কখ্খনো নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়ো না।"

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

"স্ত্রীগণ তোমাদের ভূষণ। তোমরা তাদের ভূষণ।"

আল–বাকারাহ

"আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার। এবং তিনিই তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন।"

আর–রূম

পুরুষের জীবনে তার স্ত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। যেই পুরুষ উত্তম স্ত্রী লাভ করে সে আল্লাহ্র একটি খাস নিয়ামত লাভ করে থাকে। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন,

"দুনিয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামাত হচ্ছে সদগুণ সম্পন্না স্ত্রী।"

নাসায়ী

স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে নারীর উপর জবরদস্তি করা ইসলাম সম্মত নয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

"কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কর্তা বনে যাওয়া বৈধ নয়।"

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন,

"কুমারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিয়ো না।"

ইসলাম পুরুষের উপর নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

"নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীর তেমনি অধিকার আছে"।

আল–বাকারাহ

তবে পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলার খাতিরে মহান স্রষ্টা পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

"পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব অধিকার সম্পন্ন।" আন–নিসা

আল্লাহ্ আরো বলেন,

"নারীর উপরে পুরুষের কিছুটা বেশী মর্যাদা আছে"।

আল বাকারাহ

একজন পুণ্যবতী নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

"পুণ্যবতী নারী স্বামীর অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার মর্যাদা রক্ষাকারিনী।"

আন-নিসা

ইসলাম নারীকে গৃহের রানী বানিয়েছে। বাইরে গিয়ে পুরুষ জীবিকা অন্বেষণ করবে, অর্থোপার্জন করবে। স্বামীর উপার্জিত অর্থ-সম্পদের দ্বারা গৃহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্ত্রীর। স্বামী যদি প্রচুর অর্থোপার্জন করে অথচ তার গৃহের শৃংখলা বিধানের জন্যে স্ত্রী গৃহে না থাকে, তা হলে স্বামীর এই অর্থোপার্জন শেষাবধি অর্থহীন হতেই বাধ্য। ইসলাম তাই গৃহকেই নারীর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। বাইরের কাজ থেকে নারীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তার উপর সালাতুল জুমুআ ফরয করা হয়নি। যুদ্ধে যাওয়া তার উপর ফরয নয়। জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মাসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক নয়।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আরয করলো, "সব রকমের সওয়াব ও মর্যাদাতো পুরুষরাই লুটে নিচ্ছে- জিহাদে তারা যায়, আল্লাহ্র পথে বড় বড় কাজ তারাই সম্পন্ন করে, আমরা এমন কি কাজ করতে পারি যার ফলে আমরা পুরুষ মুজাহিদদের সমান সওয়াবের অধিকারী হতে পারি?" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমাদের মধ্যেযেইস্ত্রীলোক নিজের ঘরে স্থির হয়ে থাকবে সে মুজাহিদদের সমান সওয়াব পাবে।"

-বাজ্জার

যুদ্ধের ময়দানে একজন মুজাহিদ নিরুদ্বেগ মন নিয়ে তখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে যখন সে এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে যে তার স্ত্রী পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে আপন সত্তা, তার ঘর এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধান করবে। যেই স্ত্রী স্বামীর মনে এই

নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করতে পারে, ঘরে বসেই সে জিহাদের সওয়াব পাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

নারীর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

"মর্যাদা সহকারে তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর।"

আল–আহযাব

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন,

"স্ত্রী স্বামী গৃহের তত্ত্বাবধায়ক।এই সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

সহীহুল বুখারী

নারী গৃহে অবস্থান করলে গৃহের সৌন্দর্য বাড়ে, গৃহে শৃংখলা থাকে এবং বহু অনাকাংখিত খাতে অর্থব্যয় বন্ধ হয়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় বাইরে গিয়ে নারী যেই পরিমাণ অর্থোপার্জন করে তার চেয়ে বেশী অর্থকরী ভূমিকা সে গৃহে অবস্থান করেই পালন করতে পারে। তার অনুপস্থিতিতে গৃহের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এমনসব আনাড়ী হাতে তুলে দিতে হয় যারা অর্থের বিনিময়ে যেনতেন ভাবে কাজ সম্পাদন করে এবং এসব কাজে তাদের অন্তরের কোন স্পর্শ থাকে না।

মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত ও উত্তরাধিকারীগণ যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে বীর পুরুষ রূপে গড়ে উঠতে পারে সেই জন্য ইসলাম মাতৃ–স্তনের দুধ শিশুকে খাওয়াবার নির্দেশ দেয়। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ কেবল শিশুর জন্যেই মাতৃ–স্তনে দুধের ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেন।

শিশুর সবল ও সুঠাম দেহ গঠনের জন্যে মাতৃ–স্তনের দুধ সর্বোত্তম। মাতৃস্তনের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্যে এই দুধ সর্বোত্তম নিয়ামাত। এই নিয়ামাত ভোগ করার অধিকার আল্লাহ্ই শিশুকে দিয়েছেন। এই উপাদেয় খাদ্য গ্রহণের অধিকার তখনই রক্ষিত হতে পারে যখন শিশুর আম্মা বাইরে অবস্থান না করে শিশুর কাছেই থাকে।

শিশুর সবল ও সুঠাম দেহ গড়নের সংগে সংগে আসে শিশু শিক্ষার প্রশ্নটি। শিশুকে শিক্ষাদান করতে হলে চাই সীমাহীন ধৈর্য। আল্লাহই তুলানামূলক ভাবে সেই ধৈর্য পুরুষকে কম দিয়েছেন এবং নারীকে দিয়েছেন বেশী। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাই উচ্চশিক্ষার ভিত্তি। গৃহ শিক্ষার মাধ্যমে এই ভিত্তি মজবুত করে দিতে

পারলে শিশুর শিক্ষা জীবনের পরবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করা সহজতর হয়। আর গৃহশিক্ষার এই গুরুদায়িত্ব ইসলাম নারীকেই দিয়েছে।

এরপর আসে শিশুর মানসিক সুস্থতার কথা। শিশু যদি মনস্তাত্বিক দিক থেকে সুস্থ রূপে গড়ে না উঠে তাহলে সে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষে পরিণত হয়। মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ সমাজ অংগনে কোন অবদান রাখতে পারে না। বরং সে নিজেই সমাজের বুকে নতুন আবর্জনারূপে গণ্য হয়। মনস্তাত্বিক জটিলতা একজন ব্যক্তির জীবনের সবচে' বড়ো অভিশাপ। এই ধরনের ব্যক্তি সমাজের সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতাই বাড়িয়ে তোলে। কাজেই সে নিজেও সমাজের জন্যে অভিশাপ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। মানব শিশুর এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখতে না চাইলে শিশুকালেই তার দিকে নজর দিতে হবে। রূঢ় আচরণ শিশুকে বিক্ষুব্ধ করে এবং সে মনস্তাত্বিক হোঁচট খায়। শিশু মনের স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন দরদ-ভরা আচরণ। মায়ের মনে আল্লাহ্ রাববুল আলামীন শিশুর জন্যে যেই সীমাহীন স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেছেন তার ছোঁয়া পেলেই শিশু পুলকিত হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। মায়ের স্নেহ মমতার কোন বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ্ চান নারী গৃহে অবস্থান করে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তার সন্তানদেরকে গড়ে তুলুক এবং সমাজকে মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ যুবক উপহার দিক।

ইসলাম নারীকে প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন,

"আল্লাহ্ তোমাদের বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

সহীহুল বুখারী।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক তালাক-প্রাপ্তা নারীকে বাগানে গিয়ে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খেজুরের ডাল কাটার অনুমতি দিয়েছেন।

আবুবকরের (রা) কন্যা যুবাইয়ের (রা) স্ত্রী আসমা (রা) ঘরের বাইরে গিয়ে ঘোড়াকে পানি ও খাবার দিতেন। খেজুর বীজ তুলে আনতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্ত্রীর কুটির শিল্প ছিলো। শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে তিনি সংসার চালাতেন।

উহদের যুদ্ধে আয়িশা (রা), ফাতিমা (রা), উম্মু সুলাইম (রা), হুমনা বিনতে জাহাশ (রা) আয়মান (রা) এবং উম্মু আম্মারা (রা) সৈনিকদের পানি পান করিয়েছেন এবং আহত সৈনিকদের পরিচর্যা করেছেন।

রাসূলের (সা) যুগে উম্মু আতীয়া (রা) ৭টি যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি সৈনিকদের সামান পাহারা দিতেন, খাবার তৈরী করতেন এবং আহতদের পরিচর্যা করতেন।

উমারের (রা) শাসনকালে আসমা বিনতে মুহাররমা নামের এক মহিলা আতর ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম নারীকে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দেয়নি। মাসজিদে নববীতে রাসূলের বক্তব্য শুনবার জন্যে আগত নারীদের জন্যে পৃথক বসার স্থানের ব্যবস্থা ছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব নারী যেতেন তাঁরা প্রধানতঃ মুহররাম আত্মীয়-স্বজন এবং স্বামীর সেবা করতেন। অন্যদের চিকিৎসার কাজে সাধারনতঃ শরীর স্পর্শ করা হতো না।

সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করার অধিকার নারীকে দেয়া হয়নি। সমাজের সুস্থতার ও শৃংখলা সংরক্ষণের জন্যে এই বিধান অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ্ বলেন,

"তোমরা মর্যাদাসহকারে তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াহ যুগের নারীদের মতো সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না।"

আল আহযাব

"এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, নিজেদের যৌনপবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে শুধু ঐটুকু ছাড়া যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবং তারা যেন তাদের চাদর তাদের বুকের উপর টেনে দেয় এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।"

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের উপরে চাদরের খানিকটা অংশ ঝুলিয়ে দেয়।"

আল আহযাব

এর উদ্দেশ্যে মুখমন্ডল আবৃতকরণ।

আয়িশা (রা) ইহরাম অবস্থায় বাহনে বসে পথ চলাকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"যখন লোক আমাদের সামনে আসতো আমরা আমাদের চাদর মাথার উপর হতে চেহারার উপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার চেহারা খুলে দিতাম।"

আবু দাউদ

ইসলাম উলংগপনা ও বেহায়াপনার বিরোধী। উলংগপনা ও বেহায়াপনা সমাজে অনাচার ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটিয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন,

"যেসব নারী কাপড় পরিধান করেও উলংগ থাকে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

"যেইনারী সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদের মধ্যে গমন করে সে যেনাকারিনী।।"

জামিউত তিরমিযী

"যেসব নারী কাপড় পরেও উলংগ থাকে, অপরকে তুষ্ট করে এবং অপরের দ্বারা নিজেরা তুষ্ট হয়, বুখতি উটের ন্যায় গ্রীবা বক্র করে ঠাকঠমকে চলে, তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা।"।

সহীহ মুসলিম

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। প্রকৃতপক্ষে নারী–দাসত্বের প্রধান কারণ তার অর্থনৈতিক দুর্গতি। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া নারীর পক্ষে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। তাই পারিবারিক জীবনের সূচনাতেই ইসলাম তার হাতে অর্থ তুলে দেয় মোহররূপে। তারপর তাকে দেয়া হয়েছে উত্তরাধিকারের অংশ।

উত্তরাধিকার আইনে নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেয়া হয়েছে। কারণ নারী স্বামীর নিকট থেকে মোহর ও ভরণপোষণ পায়। নারীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াযিব। নারী কোন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা লাভ করলেও তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরই থাকে।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা তুলনাহীন। ইসলাম নারীর এই মর্যাদাকে সঠিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সন্তানের নিকট মায়ের মর্যাদার গুরুত্ব কি তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদের মা–দের অবাধ্যাচরণ হারাম করেছেন।"

সহীহুল বুখারী

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো,

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমার নিকট সদ্ব্যবহার পাবার সবচে' বেশী হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার আম্মা।" সে বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, 'তোমার আম্মা।" সে বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার আম্মা।" সে বললো , "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার আব্বা।" সহীহুল বুখারী

ইসলাম নারীকে যেসব মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা সর্বোতভাবে ভারসাম্য পূর্ণ। পরিবার সংগঠনের মজবুতি, সামাজিক অনাচার রোধ এবং সার্বিক শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না। ইসলামের নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীযেই মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করেছে আর কোন কালেই সে তা পায়নি।

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে নারীর মর্যাদার কেমন স্বীকৃতি ছিলো তা উপলব্ধি করা যায় আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেন, "যদ্দিন রাসূলুল্লাহ জীবিত ছিলেন, তদ্দিন আমরা আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়ে চলতাম যাতে আমাদের জন্যে কোন শাস্তিমূলক নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর আমরা তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে শুরু করি।"

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে নারীর কর্মক্ষেত্র পুরুষের কর্মক্ষেত্র থেকে পৃথক ছিলো। উভয়ের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনই এই ব্যবস্থা নির্ধারিত করেছেন। সেই যুগে নারী যেমন তার অধিকার ভোগ করেছে, তেমনিভাবে নিষ্ঠার সংগে পালন করেছে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব।

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালেও নারী ও পুরুষ বৈধ সীমার মধ্যে থেকে একে অপরের সাহায্য করেছে, সীমা অতিক্রম করে কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করেনি।

অমুসলিমদের রক্ষণাবেক্ষণ

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করতে পারেনি, তারা জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জানমাল ও ইযযতের নিরাপত্তা লাভ করেছিলো।

অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ্র রাসূলের একটি বাণী থেকেই ভালোভাবে জানা যায়। তিনি বলেন,"যেই ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে কষ্ট দেবে, আমি তার বিরুদ্ধে। শেষ বিচারের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।"

অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (সা) যেসব উক্তি করেছেন তার ভিত্তিতে ইসলামী আইন বিশারদগণ বলেন যে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াযিব এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হারাম।

রাসূলুল্লাহ (সা) নাজরানবাসী খৃষ্টানদের সাথে যেই চুক্তি সম্পাদন করেন তাতে লিখেন, "নাজরানবাসী এবং তাদের সংগীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করছে তাদের ধন–সম্পদ, তাদের উপাসনালয় এবং আর যা কিছু তাদের আছে তার জন্যে।"

আবু বকরের (রা) শাসনকালে খালিদ ইবন ওয়ালিদ হীরা–বাসীদের সাথে যেই চুক্তি সম্পাদন করেন তাতে লিখা ছিলো, "তাদের কোন উপাসনালয় ভাংগা হবে না। তাদের কোন দুর্গ ভাংগা হবে না।"

উমার (রা) জেরুসালেমবাসী খৃষ্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে লিখে দেন, "ধর্মের ব্যাপারে তাদের উপর কোন বাড়াবাড়ি হবে না। তাদের কারো কোন অনিষ্ট করা হবে না।"

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিমের রক্ত একজন মুসলিমের রক্তের মতোই মূল্যবান। রাসূলুল্লাহর (সা) শাসনকালে একজন মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করেছিলো। হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

আলীর (রা) শাসনকালে একজন মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যাকরে। বিচারে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। পরে অবশ্য নিহত ব্যক্তির ভাই হত্যাকারীকে মা'ফ করে দেয়।

তখন ফৌজদারী আইনের চোখে একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিম সমান ছিলো। অমুসলিমের মাল মুসলিম চুরি করলে কিংবা মুসলিমের মাল অমুসলিম চুরি করলে উভয় অবস্থাতেই চোরের হাত কাটা যেতো। কোন মুসলিম কোন অমুসলিম নারীর সাথে কিংবা কোন অমুসলিম কোন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করলে উভয় অবস্থাতেই একই শাস্তির বিধান ছিলো।

অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যকলাপ তাদের ধর্মমত অনুযায়ী সম্পন্ন হতো। যেসব কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তাদের ধর্মে বৈধ তা তারা তাদের আবাসিক এলাকায় অবাধে করতে পারতো।

অমুসলিমদের কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার জিযিয়া মা'ফ করে দেয়া হতো এবং বাইতুল মাল থেকে তার জন্যে ভাতা বরাদ্দ করা হতো। জিযিয়া আদায় না করে কোন অমুসলিম মারা গেলে সেটা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করা হতো না এবং উত্তরাধিকারীদের উপর তার দায়-দায়িত্ব চাপানো হতো না।

অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উমার (রা) একটি ফরমানে লিখেন, "আমি তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছি যে যখন কোন ব্যক্তি বয়সের জন্যে কাজের অনুপযুক্ত হয়, অথবা কোন দুর্বিপাকে দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং এমন অবস্থায় পতিত হয় যে সে তার আপন জনদের নিকটেও দয়ার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তাদের জিযিয়া রহিত হবে এবং তার পরিবার বাইতুলমাল থেকে ভাতাপাবে।"

উসমান (রা) তাঁর এক ফরমানে লিখেন, "ইয়াতীম এবং অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার করো না। এরূপ করা হলে আল্লাহ্ নিজেই তার প্রতিশোধ নেবেন।"

রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়েই অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হতো। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হলে জিযিয়া নেয়া হতো না। ইয়ারমুক যুদ্ধকালে সেনাপতি আবু উবাইদাহ রণকৌশলগত কারণে সিরিয়ার

যেসব এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, সেই সব এলাকার অমুসলিমদের জিযিয়া ফেরত দেন।

উমার ইবনে আবদুল আযীযের সময়ে দামেস্কের খৃষ্টানগণ অভিযোগ আনে যে ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক তাদের ইউহান্না গীর্জাটি নিকটবর্তী মাসজিদের সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছে। উমার ইবনে আবদুল আযীয গীর্জার জমিতে মাসজিদের যেই অংশটুকু নির্মাণ করা হয়েছিলো তা ভেংগে ফেলার এবং জমি খৃষ্টানদেরকে ফেরত দেবার নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ যারা মেনে নিতে পারে না তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামই দিয়ে থাকে। দুনিয়ার আর কোথাও এর নজীর ছিলো না, আজো নেই।

সর্বোত্তম যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি প্রবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তবে এসব যুদ্ধের লক্ষ্য মালে গানিমাহ লাভ, আধিপত্য বিস্তার বা এই ধরনের কিছুই ছিলো না।

কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেছিলো, "এক ব্যক্তি মালে গানীমাহ পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি সুখ্যাতি অর্জনের জন্যে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছে?" উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন, "যেই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যে যুদ্ধ করে তার যুদ্ধই আল্লাহ্‌র পথেযুদ্ধ।"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুন্নত রাখার প্রয়োজনেই ইসলামী রাষ্ট্রকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

সৈনিকদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) নির্দেশ ছিলো, "শত্রুর মুকাবিলা কামনা করোনা। বরং আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি প্রার্থনা কর। কিন্তু মুকাবিলা অনিবার্য হয়ে পড়লে দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা কর। মনে রেখো জান্নাত রয়েছে তরবারীর ছায়ার নীচে।"

সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর সাধারণ নির্দেশ ছিলো, "কোন বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না। মালে গানীমাহ আত্মসাৎ করোনা। যুদ্ধে যা কিছু হস্তগত হয় জমা দাও। ভালো কাজ ও ভালো ব্যবহার কর। আল্লাহ্‌ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।"

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ দেন, "আহত ব্যক্তির উপর হামলা চালাবেনা। পলায়নরত ব্যক্তির পিছু নেবেনা।যেই ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলোনা।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও সৈন্য পাঠাবার কালে উপাসনালয়ের নিরীহ সেবক এবং আশ্রমবাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করতেন।

ইসলামে অতর্কিত হামলা নিষেধ। আল্লাহ্র রাসূল (সা) মক্কা ও খাইবার অভিযানে রাত্রিতেই শত্রুর জনপদে পৌঁছেন। কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করেননি।

কাউকে আগুনে পোড়ানো নিষেধ।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, "আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার অধিকার আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কারো নেই"।

নির্যাতন করে হত্যা করা নিষেধ।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) কাউকে বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

লুটতরাজ করা নিষেধ।

খাইবার যুদ্ধ জয়ের পর আল্লাহ্র রাসূল (সা) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে আহলি কিতাবের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের মারপিট করা এবং তাদের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন, কেননা যা যা দেবার তা তারা ইতিমধ্যে তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে।"

এক অভিযানে মুসলিম সৈনিকরা লুণ্ঠিত ছাগল রান্না করে খেতে বসে। আল্লাহ্র রাসূল (সা) এসে ডেকচি উল্টিয়ে দিয়ে বলেন, "লুটের জিনিসপত্র মৃত জন্তুর গোশতের মতো হারাম।"

সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ।

ইচ্ছাকৃত নাশকতাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধের সময় এমনিতেই যেই ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার কথা স্বতন্ত্র।

লাস বিকৃত করা নিষেধ।

আল্লাহ্র রাসূল বলেন, "লাসের বিকৃতি ও অবমাননা করোনা।"

বন্দী হত্যা নিষেধ।

মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্র রাসূল (সা) ঘোষণা করেন, "যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না।"

দূত হত্যা নিষেধ।

উবাবা ইবনুল হারিস মুসাইলামার ধৃষ্টতাপূর্ণ বাণী নিয়ে রাসূলের কাছে এলে তিনি বলেন, "দূত হত্যা নিষিদ্ধ নাহলে আমি তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।"

উচ্ছৃংখলতা নিষেধ।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন,"যেই ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক ব্যক্তিদের উত্যক্ত করবে কিংবা পথিকদেরকে লুন্ঠন করবে তার জিহাদ হবে না।"

চুক্তি ভংগ করা নিষেধ।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন,যেই ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিক হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে।"

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব যুদ্ধনীতি ঘোষণা করে গেছেন, খুলাফায়ে রাশিদীন সেগুলো পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। এই প্রসংগে সিরিয়া অভিযানের প্রাক্কালে আবু বকর (রা) উসামা ইবনে যায়িদের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের যেই নির্দেশ দেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেন ঃ

(১) নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না।

(২) লাস বিকৃত করবে না।

(৩) সন্ন্যাসীদের কষ্ট দেবেনা এবং উপাসনালয় ভাংবে না।

(৪) ফলবান গাছ ও ফসল নষ্ট করবেনা।

(৫) (সন্ত্রাস সৃষ্টি করে) জনবসতিগুলো জনশূন্য করবে না।

(৬) অযথা পশু হত্যা করবে না।

(৭) প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে না।

(৮) যারা বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেবে।

(৯) মালে গানীমাহ আত্মসাৎ করবে না।

(১০) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাবে না।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এবং তাঁর উত্তরসূরী খুলাফায়ে রাশিদীন যেই যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করে গেছেন তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

যুদ্ধনীতির সংগেই আসে সন্ধিনীতির কথা। শত্রু-পক্ষ সন্ধি করতে চাইলে মুসলিমগণকে শান্তির পথে এগুতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন, "তারা যদি হাত গুটিয়ে নেয়, যুদ্ধ বন্ধ করে এবং সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করে সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাদের উপর হাত তোলার কোন অবকাশ রাখেননি।"

রাসূলের (সা) শাসনকালে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) একটি চুক্তিরও বরখেলাফ করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ শান্তিচুক্তি থাকা সত্ত্বেও যখনি উস্কানীমূলক বা শত্রুতামূলক তৎপরতা শুরু করেছে তখন তার সমুচিত জবাব দিতেও তিনি দেরী করেননি।

মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু নাদীরের সাথে তাঁর একটি চুক্তি ছিলো। কথা ছিলো তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে না এবং তাঁর শত্রুদের সাহায্য করবেনা। কিন্তু শিগগিরই জানা গেলো বনু নাদীর মক্কার মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে মুসলিমদের গোপন তথ্যসমূহ সরবরাহ করছে। এমনকি তারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) হত্যার চেষ্টাও করে। বাধ্য হয়ে নবী তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অবরুদ্ধ হয়ে তারা যখন মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবার প্রস্তাব পাঠায় নবী (সা) সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে অক্ষত দেহে তাদেরকে সিরিয়ায় চলে যাবার সুযোগ দেন।

ইয়াহুদী বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে একই কারণে সামরিক অভিযান চালাতে হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি লংঘন করার কারণে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

এমন একটি উদাহরণও নেই যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন চুক্তিবদ্ধ পক্ষ চুক্তি লংঘন না করা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁদের অনুসৃত যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি মানব সভ্যতায় অতি বড়ো এক অবদান।

ইসলামের সেই স্বর্ণযুগ বিশ্ব মানবতার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। ইসলামের সেই স্বর্ণযুগের অনুকরণে নতুন সমাজ বিনির্মাণ করাই হচ্ছে বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াবাসীকে সেই পথ বেছে নেবার তাওফিক দিন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

তথ্যসূত্র

(১) সীরাতুন নবী ঃ শিবলী নুমানী

(২) আল ফারুক ঃ শিবলী নুমানী

(৩) আল জিহাদ ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

(৪) পর্দা ও ইসলাম ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

(৫) হযরত আবুবকর ঃ গোলাম মোস্তফা

(৬) হযরত ওসমান ঃ মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ

(৭) হযরত আলী ঃ আবুল ফজল

(৮) নারী ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

(৯) শাসক ওমর ফারুক ঃ শামসুল আলম

(১০) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি ঃ হযরত আলী